ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 418- 423
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.224

পাতা থেকে পর্দায়: বাংলা সিনেমায় নারী চরিত্রের বিবর্তন

ড. সোমা ব্যানার্জি, *সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা বিভাগ, নুর মোহাম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
অমৃতা চক্রবর্তী, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, নুর মোহাম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 04.11.2025; Accepted: 10.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The main objective of this research paper is to show how the role of women in Bengali cinema, especially the female characters of stories taken from literature, has been portrayed in Bengali cinema. Here, the main emphasis is given to films based on Bengali literature. Bengali literature is traditionally full of strong, fearless, rebellious and self-confident female characters full of individuality. The main aim of this work is to discuss how the oppressed and struggling female characters created by Ashapurna Devi and Mahasweta Devi, starting from the restrained, calm but determined female characters of Rabindranath and Sarat Chandra, have been adapted to entertainment. While transforming the character into a film, the director's ideas, perspectives and the audience's needs radically change the characters.

In classic Bengali cinema, it can be said that even in the golden era of Uttam-Suchitra, female characters were limited to ideal stereotypes. The characters were focused on the role of ideal lover, wife, and responsible daughter, simple or sacrificial mother. That is, male-dominated values were given priority. In such a situation, directors like Satyajit Ray, Mrinal Sen, Ritwik Ghatak brought a revolution by breaking the norms and rules of mainstream cinema. They focused on women's freedom or finding their identity by pointing a finger at social thinking. This study basically compares how different are the characters shown in the cinema from the characters described in literature and how true are they socially, has the creativity of the cinema been able to retain the original nature of the entertainment style of literature? In short, the subject of this research paper is that Bengali literature and Bengali cinema complement each other. The literary characters portrayed in Bengali cinema act as a social mirror, which reflects the place and role of women in our current society.

Keywords: Bengali literature, Bengali cinema, Evolution of women

সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়েই সৃজনশীল মাধ্যম। প্রথমটি প্রবীণ ও দ্বিতীয়টি নবীন। চলচ্চিত্র অর্থাৎ চলমানজীবন। সাহিত্যিকের খেলা শব্দ নিয়ে আর চলচ্চিত্রকারের ভূবন ক্যামেরা, লাইট, দৃশ্য, সঙ্গীত। অভিনয় যার মুখ্য মাধ্যম। বাংলা সাহিত্যের বিশাল গল্প, চরিত্র এবং বিষয়বস্তুর ভাণ্ডার চলচিত্র নির্মাতাদের প্রথমদিন থেকেই আকর্ষণ এবং অনুপ্রেরণার কেন্দ্রস্থল। কারণ, উপন্যাস বা ছোটগল্পগুলো কেবল কাব্যিক ভাষা এবং প্রতীকবাদে সমৃদ্ধ নয় বরং তাদের সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং মানসিক বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত। গবেষণাভিত্তিক সার্ভে

অনুযায়ী সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মধ্যে চলচ্চিত্রের প্রভাব জনমানসে বেশি। বইপড়া রুচিশীল বইপ্রেমী মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও চলচ্চিত্রের বিস্তার সর্বস্তরে। একটি সহজ উদাহরণ দিলে বিষয়টি আর পরিস্কার হয়ে যাবে। নয়ের দশকে রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ' বা 'মহাভারত' দেখার জন্য দূরদর্শনের সামনে সকাল ৯ টার সময় গ্রাম, শহর নির্বিশেষে যে পরিমান মানুষ অধীর উৎসাহে বসে থাকত সেই পরিমান উৎসাহ কিন্তু 'রামায়ণ' বা 'মহাভারত' পাঠে দেখা দুর্লভ। আসলে চলচ্চিত্র একই সঙ্গে audio-visual বলে জনমানসে প্রভাব বেশি। চলচ্চিত্র একই অঙ্গে চলমান, দৃশ্যমান এবং ভাষা সম্বলিত। ১৬৬০ সালের দিকে গ্লাস সাইড দিয়ে ম্যাজিক ল্যান টার্ম দেখানোর মধ্যে দিয়ে চলচ্চিত্রের প্রস্তুতি শুরু হয় বিশ্বে। পরবর্তীকালে সফল ভাবে প্রদর্শিত হয় ১৮৯৬ সালে থিয়েটারস্কোপ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে।

সাহিত্যের ভাষা, বাক্য বা শব্দ যখন পর্দার চরিত্রের মুখের সংলাপ হয়ে শোনা বা দেখা যায় তা হয় হৃদয়স্পর্শী। সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের এই ক্রমাগত আদান-প্রদান ঐতিহ্য এবং রূপান্তর উভয়েরই একটি শক্তিশালী দর্পণ হিসেবে কাজ করে। সময়ের সাথে সাথে বাংলা চলচ্চিত্রে নারীর চিত্রায়ন উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে, যা সাংস্কৃতিক ভাবধারা, মূল্যবোধ, লিঙ্গগত গতিশীলতা এবং নারীর অগ্রাধিকারের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। প্রথম দিকে চলচ্চিত্রের নারী চরিত্রগুলো কেবলমাত্র আদর্শিক ভুমিকায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সামাজিক এবং মানসিক নবজাগরণনের পর, সমান্তরাল/ আর্ট সিনেমাগুলো এই নির্দিষ্ট স্টেরিওটাইপ ভাবধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে আত্ম-অধিকারবোধ সামাজিক চেতনা সম্পন্ন নারীদের চিত্রিত করা শুরু করে। এই গবেষণা পত্রটির মূল উদ্দ্যেশ হল সাহিত্যের আভিযোজনে চলচ্চিত্রের নারী চারিত্রগুলি কী ভাবে নির্মিত হয় তা বিশ্লেষণ করা। বড় পর্দায় আদর্শ ঘরোয়া স্ত্রী থেকে স্বাধীনচেতা বিদ্রোহী স্ত্রীর যে অবতারণা তা নিয়ে আলোচনা করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণাটি তুলে ধরার চেষ্টা করছে সাহিত্য ও সিনেমা কিভাবে একসাথে বাঙালি সমাজে প্রচলিত লিঙ্গগত নিয়মগুলিকে প্রতিফলিত করে এবং প্রতিমুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করে।

বাংলা চলচিত্র এবং বাংলা সাহিত্য:

এবার আসি বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। বাংলা চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের পথচলা হাত ধরাধরি করে। চলচ্চিত্রে সাহিত্যের ছায়া মানেই মানব মনের সাথে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক যা বাংলা চলচ্চিত্রেকে বিনোদনের থেকেও বেশী একটি শৈল্পিক মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছে।

১৯১৯-১৯৩০ সাল বাংলা চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগ। ১৯১৯ সালের ১লা নভেম্বর মুক্তি পেল কর্নওয়ালিস থিয়েটারে প্রথম বাংলা নির্বাক চলচ্চিত্র ম্যাডান কোম্পানির 'বিল্বমঙ্গল'। পরিচালক হীরালাল সেন। ১৯৩১ সালে ১১ এপ্রিল অমর চৌধুরী পরিচালিত মদন থিয়েটার কোম্পানির প্রযোজনায় সৃষ্ট প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের সবাক চলচ্চিত্র 'জামাই ষষ্ঠী'।এরপর যে সময়টা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি হল ত্রিশের দশক। ১৯৩০ সালে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের পরিচালনায় জন্ম নিল 'নিউ থিয়েটার্স'। বাংলা সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের মেলবন্ধনে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর লক্ষই ছিল সাহিত্য প্রধান সিনেমা নির্মাণ। ছোটো থেকেই দেশ-বিদেশের সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। 'নিউ থিয়েটার্স' প্রযোজিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রগুলি হল 'দেনাপাওনা' (১৯৩১), 'নটীর পূজা' (১৯৩২), 'দেবদাস' (১৯৩৫)। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় 'নটীর পূজা' যার নির্দেশনায় ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সঙ্গীত পরিচালনায় কবির সকল গানের কাণ্ডারি দীনুবাবু। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বাংলা চলচ্চিত্রের আবির্ভাব কালে বাংলা সাহিত্য কিন্তু নাবালক দশা অতিক্রম করে রীতিমতো সাবালক।

একটু পিছিয়ে যায়, সাল ১৯২২; একটি নয়, দুদুটি নির্বাক চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সুত্রপাত হল বাংলা সাহিত্যের চলচ্চিত্রায়নের। একটি এপ্রিল মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস অবলম্বনে 'বিষবৃক্ষ' এবং সেপ্টেম্বরে মুক্তি পেল শরৎচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে 'আঁধারে আলো'। প্রথমটির পরিচালক শিশির ভাদুড়ি ও দ্বিতীয়টির পরিচালক নরেশচন্দ্র মিত্র। ১৯৩৫ সালে প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাস অবলম্বনে 'দেবদাস' কে প্রথম বাংলা মেগাহিট সিনেমা বলা যায়। এর নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রমথেশ বড়ুয়া, পার্বতী যমুনা বড়ুয়া এবং চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবতী দেবী। 'দেবদাস' অবলম্বনে ৫টি ভাষায় ১৬টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছিল। এখান থেকে উপলব্ধি করা যায় 'দেবদাসে'র জনপ্রিয়তা।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেশিরভাগ বাংলা চলচ্চিত্র বানিজ্যিক বা শিল্পসম্মত উভয় ধারার মূল ভিত্তি ছিল বাংলা সাহিত্য। সত্যজিৎ রায় থেকে শুরু করে ঋত্বিক ঘটক, মৃনাল সেন, তপন সিংহ, তরুন মজুমদার, অগ্রদূত, অজয় কর, অরুন্ধতী দেবী প্রমুখেরা চলচ্চিত্রের প্লট হিসেবে সাহিত্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।১৯৫৫ সালে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় মুক্তি পেল বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী' অবলম্বনে 'পথের পাঁচালী'। প্রকৃতির সন্তান অপু, দুর্গার জীবনের নানা বাঁক। বিশ্বসিনেমার ইতিহাসে যার নাম খোদিত। সাহিত্যের দর্পণে চিত্রায়িত হয় সমাজ ও সমাজসংলগ্ন মানুষের জীবনবেদ। সেই সাহিত্য কীর্তিকে জলজ্যান্তভাবে দৃশ্যমান করেছেন পরিচালকেরা নিজস্ব সৃষ্টিশীলতাই। তপন সিংহের 'অতিথি', তরুন মজুমদারের 'বালিকা বধূ', সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর', অরুন্ধতী দেবীর 'দীপার প্রেম', অজয় করের 'সপ্তপদী'-তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। তখন ছিল বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ। ভাবে ভাষায় আখ্যানে সমৃদ্ধ সাহিত্যকেই পরিচালকেরা বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের সৃজনশীলতার প্রকাশ হিসেবে। এতে তাঁরা ব্যবসায়িক দিক থেকে যেমন সফল হয়েছিলেন তেমনি শিল্পীসত্ত্বার প্রকাশেও সমালোচকদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র অভিযোজনে নারী:

একথা বললে অত্যুক্তি হয়না যে বাংলা সাহিত্য জগতে নারী মহিমান্বিত, যেখানে নারী একটি কেন্দ্রীয় ও গরিমাময় স্থানে অবতীর্ণ। বইয়ের পাতা থেকে সিনেমার পর্দায় এই যাত্রা পথে উঠে আসে তাদের ধারাবাহিক প্রেম, ত্যাগ, বিদ্রোহ, নীরবতা ও শাক্তির ইতিকথা। রবীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্ট নারী চরিত্র যেমন— 'চোখের বালি'র বিনোদিনী, 'নষ্টনীড়' এর চারুলতা, 'ঘরে-বাইরে' র বিমলা বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জটিল এবং বৈচিত্র্যময় নারী চরিত্র। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই সকল নারী চরিত্রের নীরব বিদ্রোহ, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মমর্যাদার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা দর্শকেরা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিলিয়ে নিতে পারে। একইভাবে, শরৎচন্দ্রের নায়িকারা যেমন 'পরিণীতা' র ললিতা, 'দেবদাসে' র পারো আর চন্দ্রমুখী, 'শ্রীকান্ত' র রাজলক্ষ্মীদের সম্মুখীন হতে হয়েছে সামাজিক সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার টানাপোড়েনে। এই চরিত্রগুলোর সিনেমাটিক উপস্থাপনা তাদের সংগ্রামী মানসিকতা এবং নৈতিক প্রত্যাশাগুলিকে এক অন্য মাত্রায় পরিচালিত করে।

তাছারাও, বাঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভুতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের লেখনীতে নারী মনের ব্যথা-বেদনার, প্রেম-ভালোবাসা, খুব স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। পরবর্তী কালে সিনেমার মাধ্যমে এই সকল লেখকদের লেখনী সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে দাগ কেটে দেয়। চরিত্রগুলি বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসে পর্দায় আরও জীবন্ত ও বাঙময়ী হয়ে ওঠে। পর্দার বাইরের মানুষগুলো সেখানে নিজেদের খুঁজে পায় এবং জনমানবে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে।

আরও সমসাময়িক সময়ে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তিলোত্তমা মজুমদার, শঙ্কর, স্বপ্নময় চক্রবর্তী প্রমুখের কলমে উঠে এসেছে এমন নারী চরিত্র যারা নগর, জটিল এবং আধুনিক সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিনিধি। তাদের অনেক কাজ সিনেমার অভিব্যক্তি পেয়েছে, সাহিত্য নির্ভর সিনেমাগুলোকে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা এবং রুপোলী পর্দায় নারীর প্রতিনিধিত্বে নতুন স্তর যুক্ত করেছে।

এই আধুনিক সাহিত্যকর্মগুলিকে চলচ্চিত্র নির্মাতারা চলচ্চিত্রায়িত করেন, যেখানে নারীর অস্তিত্ব, কর্তৃত্ব, পরিচয়, যৌনতা, প্রাতিরোধ, প্রতিবাদ এককথায় কোনো দেবীত্ব নয়; প্রকাশিত হয় তার রক্ত মাংসের মানবীসত্ত্বা। মূল বিষয়বস্তুকে অক্ষুণ্ণ রেখে সময় ও সমাজের সাথে তাদের অভিযোজিত করা হয়। আশাপূর্ণা দেবী এবং মহাশ্বেতা দেবীর নারীরা শক্তিশালী সিনেমার আখ্যানকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন, প্রান্তিক এবং পুনর্গঠিত- গ্রামীণ নারী, উপ-বয়স্ক ব্যক্তিত্ব এবং দৈনন্দিন বিদ্রোহীদের কণ্ঠস্বর ও ভাবমূর্তি প্রদান করে চলেছেন। এই চরিত্রগুলি সাহিত্য থেকে সিনেমায় রূপান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে অনিবার্যভাবে পরিবর্তন ঘটে: কিছু দিক দৃশ্যমান এবং নাটকীয় প্রভাবের জন্য প্রসারিত করা হয়, কিছু পরিবর্তন করা হয় দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী, আবার কিছু দিক বর্ণনামূলক কাঠামোর সাথে মানানসই করে সৃজন করা হয়। ক্লাসিক সাহিত্য চলচ্চিত্রের পর্দায় হয়ে ওঠে মানব জীবনের বেদ। এভাবেই বোঝা যায়, সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র উভয়েই শব্দ এবং পর্দা দুই এর মাধ্যমে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে রীতিনীতি অর্থাৎ সামগ্রিকতাকে যেমন প্রতিফলিত করছে তেমনি অহরহ সমাজের রঙিন কার্পেটকে সারিয়ে নগ্ন সত্যতাকে চ্যালেঞ্জ ও করছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্মুখী নায়িকা থেকে মহাশ্বেতা দেবীর আধুনিকা নারী চরিত্র, সিনেমার মাধ্যমে গতিশীল ও পরিবর্তনশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। পরিবর্তিত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে চলচ্চিত্র নির্মাতারা যখন এই সকল নারীদের সংগ্রাম এবং আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্ব্যাখ্যা করেন, তখন পর্দায় তাদের উপস্থিতি আরও প্রাসঙ্গিক ও স্তরীভূত হয়ে ওঠে। প্রাথমিক দশকগুলিতে, বিশেষ করে মূলধারার বাংলা সিনেমার মধ্যে, নারী চরিত্রগুলি প্রায়শই আদর্শিক ভূমিকায় সীমাবদ্ধ ছিল— কর্তব্যপরায়ণ স্ত্রী বা ভগিনী, আত্মত্যাগী মা বা রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে চিত্রিত হয়েছিল, যা ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ প্রত্যাশাকে শক্তিশালী করেছিল।

বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে আমরা সকলেই কমবেশি পরিচিত। আর সত্যজিতের 'পথের পাঁচালী' সিনেমায় কাশবনের মধ্যে দিয়ে অপু-দুর্গার দৌড়ানো, সামনে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার দৃশ্য বাঙ্গালীর কাছে এক নস্টালজিয়া। সিনেমার শুরুতেই ভাঙা দালানে চাঁদনী রাতে ইন্দির ঠাকরুন ওরফে চুনিবালা দেবী 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে' গানটি গায়। এই গান যেন শুধু ইন্দির ঠাকরুন নয়; প্রতিটি মানবের জীবনের চরম সত্যকে ব্যক্ত করে। জীবনের বহুপথ পার করে ইন্দির ঠাকরুন শুনতে পায় মৃত্যুর ডাক! বিভূতিভূষণ আর সত্যজিৎ, সিনেমা আর সাহিত্য কোথায় যেন মিলে মিশে এক হয়ে যায়। আর জেগে থাকে 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিতের আরো একটি সাহিত্য নির্ভর সিনেমা 'চারুলতা' (১৯৬৪)। অবলম্বন রবিঠাকুরের 'নষ্টনীড়' গল্প। চলচ্চিত্রটি মানব সম্পর্কের জটিলতা ও নারী চরিত্রের আত্ম আবিস্কারে অনুরণিত হয়। সাহিত্যাশ্রায়ী চলচ্চিত্রের মূল কথা হল মূল গল্পের 'থীম' অটুট রাখা। সত্যজিৎ এক্ষেত্রে একশো শতাংশ সফল। পরিচালক খুব সুন্দর ভাবে সাহিত্য ও সিনেমার সম্পর্ককে খোঁজার চেষ্টা করেছেন। যেমন, 'নষ্টনীড়' গল্পের পরিণতিতে বিচ্ছেদকে কীভাবে দেখানো যেতে পারে সে সম্পর্কে সত্যজিৎ বলেছেন:

> "এ দৃশ্যে তাই হাত মেলাতে পারেনা। ভবিষ্যতে মিলবে কি? জানিনা। জানার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথও জানার প্রয়োজন বোধ করেননি। আজকের মতো ঘর ভেঙে গেছে, ছেলেমানুষি কল্পনার জগত থেকে রূঢ় বাস্তব জগতে নেমে এসেছে দুজনেই। এটাই বড়ো কথা। এটাই নষ্টনীড়ের থীম।"[১]

গল্পকারের ভাবনার প্রতি সততা বজায় অবশ্যই চলচ্চিত্রকারকে রাখতে হবে। না হলে, দুজনের ভাবনার মাঝে দূরত্ব তৈরি হবে। যা কখনোই কাম্য নয়।সত্যজিতের মতো মৃণাল সেন সেভাবে সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্রের জন্য খ্যাত নন। যদিও তাঁর পরিচালিত 'ভূবন সোম' (১৯৬৯) যাকে বাংলা সিনেমার নতুন দিশারী বলা যায় তা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুলের উপন্যাস সম বড়ো গল্প 'ভূবন সোম' অবলম্বনে নির্মিত। 'সচিত্র ভারত' নামে শারদীয়া পত্রিকায় ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। ভূবন সোম যখন প্রথম গৌরীকে দেখলেন সেই দৃশ্যটি বনফুল এইভাবে তুলে ধরেছেন:

> "মেয়েটা সড়াৎ করে চড়ে পড়ল মোষটার পিঠে। কোন সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার অত তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠে চড়তে পারতনা। ভূবন সোম অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। মহিষমর্দিনীর কথা চণ্ডীতে পড়েছিলেন, আজ স্বচক্ষে দেখলেন।"[২]

পর্দায় প্রায় অনুরূপ দৃশ্যটিকে পরিচালক তুলে ধরেছেন। কারণ উভয়ের ভাবনাই যে ছিল এক। সত্তরের দশকের শেষে আমরা দেখতে পেলাম মৃণালের চলচ্চিত্র জীবনের একটি পরিবর্তন। ১৯৭৯ সালে 'একদিন প্রতিদিন' এ ন্যারেটিভ ফর্মে ফিরে এলেন। অন্বেষণ করলেন জীবনের ফাঁকফোকর। চিত্রনাট্য পরিচালক রচনা করেছিলেন। সিনেমা, সাহিত্য ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। কোন শিল্পই জীবন নিরপেক্ষ নয়।কথায় বলে literature divorced from life is no literature at all. Art for art's sake এর পরিবর্তে বলতে হয়:

> "শুনহ মানুষ ভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য/তাহার ওপরে নাই" (চন্ডীদাস) ।

সিনেমা, সাহিত্য এভাবেই যুগযুগান্ত ধরে সমাজ সংলগ্ন মানুষের কথা বলে নিজস্ব ভাষায়। হয়তো প্রকাশ আলাদা কিন্তু উদ্দেশ্য এক।

ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' (১৯৫৮) সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্প অবলম্বনে নির্মিত। এ এক না মানুষী প্রেমের গল্প। গল্পের নায়ক বিমল এবং নায়িকা তাঁর পুরনো ট্যাক্সি 'জগদ্দল'। নতুন যুগে সে সত্যিই জগদ্দল। ভীষণ বেমানান। তবু বিমল তাকে যত্ন করে, সাজিয়ে দেয়, তোয়াজ করে। তার শুষ্ক মরুসম জীবনে জগদ্দলই একমাত্র আপনজন;

কাছেরজন— একমাত্র ভালোবাসা। চেতন ও অচেতনের এই প্রেমময় সম্পর্ক আমরা দেখতে পাই যখন বিমল মাটিতে বসে জগদ্দলের গায়ে পরম ভরসায় গা এলিয়ে গান করে। সারা পৃথিবীকে জানাতে চায় জগদ্দলই তার আশ্রয়, বন্ধু, ভালবাসা, প্রেম। বিশ্বের কাছে নিছক একটা পুরানো অকেজো গাড়ি। কিন্তু বিমলের কাছে? যন্ত্র হয়ে ওঠে অযান্ত্রিক প্রেমের পৃথিবীতে। সুবোধ ঘোষের 'বিমল' এবং ঋত্বিকের 'বিমল' এক সুত্রে বাঁধা পড়ে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় ও পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের অসামান্য পরিচালনায়।

আরো দুই বরেন্য পরিচালক তপন সিংহ এবং তরুন মজুমদার। উভয়েই সাহিত্যাশ্রিত চলচ্চিত্র নির্মাণে আগ্রহী এবং পথিকৃত। তপন সিংহ পরিচালিত 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' (১৯৬২) দেখে স্বয়ং ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। আর তরুন মজুমদার মানেই সাহিত্যাশ্রিত সিনেমা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের সার্থক প্রয়োগ। 'পলাতক', 'বালিকা বধূ', 'ঠগিনী', 'সংসার সীমান্তে', 'গণদেবতা'— তালিকা অগণন। তরুন মজুমদার স্টার সিস্টেমকে ভেঙে গল্পকে প্রাধান্য দিলেন। যেমন, মনোজ বসুর 'আংটি চাটুজ্জের ভাই' গল্প অবলম্বনে 'পলাতক' (১৯৬৩) যেখানে নায়ক অনুপকুমার কৌতুক অভিনেতা হিসেবে পরিচিত এবং সেই সময় উত্তমকুমার নামক একজন স্টারের জন্ম কিন্তু বাংলা সিনেমায় হয়ে গেছে। তরুন মজুমদার বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, বিমল করের লেখার চলচ্চিত্রায়ন বেশি করেন। এমনকি তাঁর পরিচালিত 'ভালোবাসার বাড়ি' (২০১৮) এই প্রজন্মের ঔপন্যাসিক প্রচেত গুপ্তর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত।

এটা ঠিক চলচ্চিত্রের রূপায়ন সাহিত্যিকের বা সাহিত্যানুরাগীর মনের মতো নাও হতে পারে; চলচ্চিত্র রূপে সফল হলেও। আসলে এটা মেনে নিতে দ্বিধা নেই সাহিত্য ও চলচ্চিত্র উভয়েই স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম। তাই দুজনেই দুজনকে গ্রহন করবে আপন স্বাতন্ত্র অটুট রেখে। প্রাবন্ধিক পবিত্র সরকার এই প্রসঙ্গে বলেছেন:

> "শেষ পর্যন্ত এই কথাটা হয়তো স্বীকার করে নিতে হবে যে, চলচ্চিত্র আর সাহিত্যের মধ্যে একটা অনুবাদ সম্পর্ক চিরকাল থাকবেই। অনুবাদ বলতে আমরা আক্ষরিক অনুবাদ বোঝাচ্ছিনা, বোঝাচ্ছি এক ধরনের জন্মান্তর।"[৩]

বলা যেতে পারে সাহিত্যের নবজন্ম হয় চলচ্চিত্রের হাত ধরে অর্থাৎ বলতে পারি Transcreation।

উপসংহার:

বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রে নারী চরিত্রের যাত্রা একটি দুরূহ এবং ক্রমবিবর্তনের প্রকাশ যা তৎকালীন বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। সাহিত্য ও সিনেমা উভয়ই সাংস্কৃতিক আয়না হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। পৃষ্ঠা এবং পর্দায় নারীর চিত্রায়ন কখনই নিরপেক্ষ ছিল না, না আছে। এই চিত্রায়ন বিভিন্ন সামাজিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক মতাদর্শগুলোকে কিন্তু উপেক্ষা করতে পারে না। মূল ধারার সাহিত্য নির্ভর বাংলা সিনেমার নারী চরিত্ররা আইকনিক বা রোলমডেল হয়ে উঠলেও কমার্শিয়াল বা বানিজ্যিক সিনেমাগুলিতে প্রায়শই নারীকে পণ্যে পরিণত হতে হয়েছে। একথা অস্বীকার করা যায়না। সেখানে নারীদেহকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পণ্যের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। এই পণ্যীকরণ বাংলার শিল্প বা সাহিত্যে কোনমতেই কাম্য নয়।

মনে রাখতে হবে সাহিত্যের ভাষাকে চলচ্চিত্রে রূপদানের জন্য সবার আগে দরকার এমন ব্যক্তির যিনি সাহিত্য ভাবনায় সমৃদ্ধ ও অনুভূতিশীল। সেম কাইন্ড অফ পারসেপশন এর যোগ্য। যিনি গল্পের অক্ষরের দিকে না তাকিয়ে তাকাবেন গল্পকারের মূল ভাবনার দিকে। নিউ থিয়েটার্সের উদ্যোগে সাহিত্য নির্ভর বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের যে পথচলা শুরু হয়ে ছিল তা এখনো ক্রমবিদ্যমান। কখনো তা হয় সুনীলের কাকাবাবুকে সামনে রেখে, কখনো শরদিন্দুর ব্যোমকেশ, সত্যজিতের ফেলুদা কিম্বা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের মিতিন। উল্লিখিত উদাহরণগুলি প্রতিটি গোয়েন্দা কাহিনী একথা ঠিক কিন্তু সাহিত্যনির্ভর তো! এর বাইরেও বাংলা সাহিত্য ও সিনেমার একসাথে চলার নিদর্শন রয়েছে। আসলে বাঙালী দর্শক এবং পরিচালক উভয়ের কাছেই সাহিত্যাশ্রয়ী চলচ্চিত্রের আবেদন শাশ্বত।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সত্যজিৎ। বিষয় চলচ্চিত্র, অষ্টম মুদ্রণ ২০০৯, আনন্দ পাবলিশার্স পৃ. ৯৯।
২. বনফুল। ভূবন সোম। ডি. এম লাইব্রেরী, প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৬৩।

৩. আচার্য, নির্মাল্য ও পালিত, দিব্যেন্দু। শতবর্ষে চলচ্চিত্র। ২০২৪, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১৬৪।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. পত্রী, পূর্ণেন্দু। সিনেমা সংক্রান্ত। জানুয়ারি ২০২০, Generic Publisher.
২. চক্রবর্তী, পিনাকী। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিউ থিয়েটার্স। ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স।
৩. দাসগুপ্ত, চিদানন্দ। বাংলা সিনেমা ও তার ইতিহাস। ২০০২, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২০-১৪৫।
৪. রায়, সত্যজিত। Our Films Their Films. (বাংলা অনুবাদ সংস্করণ), ২০০৪, কলকাতা, বিশ্বভারতী প্রকাশনী, পৃ. ৪৫-৭০।